দলবদল নয়
দিনবদল

দলবদল নয়, দিনবদল

চৌত্রিশ বছরে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময় কখনও হয়নি। কখনও বলতে হয়নি ‘সততার প্রতীক’, কিংবা ‘বাংলার গর্ব’।

এখন চলছে ‘বাংলার গর্ব মমতা’।

রাজ্য মুখ ঢেকেছে বিজ্ঞাপনে। নিজেই নিজের নামে প্রচারের উদ্বোধন করেছেন। আত্মপ্রচারের এক বেনজির দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর কখনও নিজেকে ‘দয়ার সাগর’ বলেননি। কিংবা রবীন্দ্রনাথ নিজেকে বলেননি ‘বিশ্বকবি’।

তিনি বলেছেন। অতএব ধ্রুবসত্য!

বাংলায় গত একদশকে এটাই দস্তুর। তিনি বলেছেন। শুধু তিনিই বলেছেন। আর বাকিরা– মন্ত্রিসভা থেকে বিধানসভা সবাই নিছকই শ্রোতা।

সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা স্বীকৃত। সেদিন নেই। বিরোধীশূন্য পঞ্চায়েত থেকে তিনি চেয়েছেন বিরোধীশূন্য বিধানসভা। সংবাদমাধ্যম

সামান্য সমালোচনা করলেই চোখ রাঙিয়েছেন। সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। হুমকিতে কাজ না হলে বেমালুম বন্ধও করে দিয়েছেন। আদালত রায় দিলে তা অমান্য করেছেন। আবার কখনও পত্রিকার সম্পাদককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আসার সমন পাঠিয়েছেন।

বিপন্ন শিল্পের স্বাধীনতা। সেন্সরের ওপর সেন্সর। অনীক দত্তের 'ভবিষ্যতের ভূত'। চব্বিশ ঘন্টার আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে সমস্ত মাল্টিপ্লেক্স থেকে। যদিও ছবিটি ছিল নিখাদই একটি পলিটিক্যাল স্যাটায়ার। রাজনৈতিক বিদ্রূপ। যেমন গ্রেট ডিক্টেটর, হীরক রাজার দেশে। আর তাতেই কোপ। অথচ, কে না জানেন সমালোচনা, ভিন্নমতের অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, বিরোধীদের ভূমিকা– গণতন্ত্রের অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

ভবিষ্যতের ভূত, অনীকই প্রথম নন। সামাজিক মাধ্যমে ব্যঙ্গচিত্র এঁকে জেলে যেতে হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে। নিরীহ প্রশ্ন তোলার 'অপরাধে' প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজের গায়ে মুখ্যমন্ত্রী বেমালুম সেঁটে দিয়েছেন 'মাওবাদী' তকমা। সমাবেশে ধানের দাম নিয়ে অসহায় প্রশ্ন তোলায় জেলে যেতে হয়েছে শিলাদিত্যকে।

ছাত্র সংসদের নির্বাচন চেয়ে পুলিশের লাঠিতে শহীদ হয়েছে সুদীপ্ত গুপ্ত। ২০১১ থেকে লাল ঝাণ্ডার আড়াই হাজার পার্টি অফিস জবরদখল। হাজার হাজার পার্টি কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে গ্রেপ্তার। হাজার হাজার পার্টি কর্মী ঘরছাড়া। বামপন্থী সমর্থকদের দোকান লুট, ভাঙচুর। কোথাও কৃষককে নিজের জমিতে চাষ করতে না দেওয়া। কোথাও জমি থেকে পাট্টাদার, বর্গাদারকে উচ্ছেদ। কোটি কোটি টাকা জরিমানা আদায়। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, এ-গলি, ও-গলি সব দখল।

এক কামদুনি নয়, সাত থেকে সত্তর ধর্ষণ। মহিলাদের উপর অপরাধে তিন নম্বরে রাজ্য। ২০১৮, দেশে অ্যাসিড হামলায় শীর্ষে রাজ্য (এনসিআরবি)। দলদাসের ভূমিকায় পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সবই ‘সাজানো ঘটনা’! কিংবা ‘ছোট ঘটনা’, ‘তিলকে তাল করা’!

পার্ক স্ট্রিটে গণধর্ষণ। চায়ের পেয়ালায় মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলেছিলেন ‘সাজানো ঘটনা’! যদিও সাজানো ঘটনার তত্ত্ব নস্যাৎ করে তৎকালীন গোয়েন্দাপ্রধান দময়ন্তী সেন প্রথম জানান, গণধর্ষণই হয়েছে। তাঁর উদ্যোগেই ধরা হয় তিন অভিযুক্তকে। নিট ফল: মহাকরণে ডেকে তুরন্ত দময়ন্তীর বদলি। যেমন যোগী সরকার দাবি করেছে হাথরসের ঘটনায়। যোগী সরকার যেভাবে রাতের অন্ধকারে দেহ পুড়িয়ে দিয়েছে, তেমনই বাংলা দেখেছে ধর্ষিতার লাশ পোড়াতে নিমতলা শ্মশানে তৃণমূলের নাটক। কলকাতা পুলিশকে দিয়ে গরিব ট্যাক্সি চালকের মেয়েটিকে নিয়ে কী করা হয়েছিল, কেউ ভোলেননি। সেদিন দময়ন্তী সেনের বদলিতে বার্তা ছিল স্পষ্ট। মুহূর্তে প্রশাসনও বুঝে যায় কীরকম থাকতে হবে। কীভাবে আড়াল করতে হবে অপরাধ, অপরাধীকে। কীভাবে নিতে হবে দলদাসের ভূমিকা।

একই লাইনে দাঁড়িয়ে যোগী আর মমতা। যোগীর মতোই রাজ্যে বলরামপুর, উন্নাও, হাথরস বানাচ্ছেন মমতা।

রায়গঞ্জ কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে নিগ্রহ। নাম জড়ায় তৃণমূল নেতার। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছোট ঘটনা! রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক মারধর! মুখ্যমন্ত্রীর গলায় পরিচিত লব্জ: ছোট ঘটনা।

নির্বাচনের আগেই বিপুল আসনে জয় ‘বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়’। নির্বাচনের দিন ভোটের নামে প্রহসন। আর নির্বাচনের পর চোখ রাঙিয়ে দল ভাঙিয়ে বাকিটুকু দখল। গণতন্ত্র হত্যা।

সত্তর দশকে এরকমই এক নৈরাজ্য কাটিয়ে সাতাত্তর। রাজ্যে বামফ্রন্ট। একদিনে নয়। দশকের পর দশক ধরে শ্রেণিসংগ্রাম আর গণআন্দোলনের ফসল। আধা ফ্যাসিবাদী অত্যাচারের রক্তচিহ্ন সারা শরীরে বহন করে, বুকের মধ্যে চেপে রাখা স্বজন হারানোর যন্ত্রণা নিয়ে সংগ্রাম আর সাফল্যে এক নতুন অধ্যায়। একটি

সুশাসন। গ্রামে-শহরে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার। এক নতুন পরিবেশ। এক অপ্রতিহত অগ্রগতির যুগের যাত্রা শুরু।

দায়িত্বে এসেই বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত– অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নয়। বিরোধী ও বিরোধিতার পূর্ণ স্বাধীনতা। রাজনৈতিক বন্দিদের বিনা শর্তে মুক্তি। অধিকাংশই ছিলেন নকশালপন্থীরা। যাদের হাতে বামপন্থী কর্মীরা খুন হয়েছিলেন, মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরাও। সমকালীন ভারতে এক সাহাসী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বিনা বিচারের মতো বর্বর প্রথা রদ। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণের জন্য ব্যবহার করা হয়নি পুলিশকে। আগের কংগ্রেস জমানায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙাই ছিল পুলিশের মুখ্য কাজ। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে মর্যাদা দেয় সরকার। পুলিশকে দেয় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। সরকারি কর্মীদের ধর্মঘট করতে দেওয়ার অধিকার। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ধর্মঘট ভাঙতে কখনও পুলিশ পাঠায়নি বামফ্রন্ট সরকার। বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপকে কখনও পুলিশ, কিংবা প্রশাসনকে দিয়ে দমন করেনি। সংবাদমাধ্যমের অধিকাংশই ছিল বিরোধী বা শত্রুতার ভূমিকায়। শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছে কুৎসা-অপপ্রচার। কিন্তু তাই বলে রাজ্য সরকার কখনও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। কট্টর সমালোচক সংবাদমাধ্যমও পেয়েছে সরকারি বিজ্ঞাপন। দেশের মধ্যে প্রথম, বামফ্রন্ট সরকারই রাজ্যস্তরে গড়েছে মানবাধিকার কমিশন। সুপারিশও কার্যকর।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শপথ নেওয়ার পরেই ঘোষণা করেছিলেন, বামফ্রন্ট শুধুমাত্র রাইটার্স বিল্ডিং থেকে সরকার চালাবে না। গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাবে। এবং নিছক ঘোষণা নয়। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। প্রথম আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। গ্রামের সরকার। গরিবের হাতে ক্ষমতা। নিবিড় গ্রামীন বিকাশ। মানবসম্পদ উন্নয়নে এক অভাবনীয় সাফল্য। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৯৮৭-তে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সারা দেশে এই ব্যবস্থা। পরে

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ৩৩ শতাংশ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ। পঞ্চায়েতে মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে ১৯৯২ সালে গ্রাম সংসদ। মানে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের আগেই। পঞ্চায়েতে গণ অংশগ্রহণে পশ্চিমবঙ্গই এদেশে পথপ্রদর্শক। পাশাপাশি শহরাঞ্চলে পৌর ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ।

সেইসঙ্গে ভূমি সংস্কার। বামপন্থীরা বরাবরই জমির কেন্দ্রীভবন ভেঙে ফেলার কাজকে যুগ যুগ ধরে দীর্ণ কৃষি ও কৃষক সমাজের উন্নতির সামনে দুস্তর বাধার প্রাচীর ভাঙার প্রধান এক মর্মবস্তু হিসেবে বুঝে এসেছে। এই সাফল্য পথ দেখিয়েছে গোটা দেশকে।

সারা দেশে জমির মাত্র ৩ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। অথচ, গোটা দেশে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমি বন্টনের ২২ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গে। ভূমি সংস্কারের ফলেই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা ৮৪ শতাংশ কৃষি জমির মালিক। জাতীয় স্তরে যা ৩৪ শতাংশের সামান্য বেশি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে ৩০ লক্ষের বেশি কৃষক পান ১১ লক্ষ ২৭ হাজার একরেরও বেশি জমি।

বামফ্রন্ট সরকার মানে অপারেশন বর্গা। ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার নথিভূক্ত বর্গাদারের আইনী অধিকার। বর্গা উচ্ছেদ আটকাতে ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরেই ভূমি সংস্কার আইনের সংশোধন করে বামফ্রন্ট সরকার। শুধু গ্রাম নয়। শহরেও গরির মানুষকে বসবাসের জমি দিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ। উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত জমি প্রদান। ঠিকা প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন, কুড়ি বছরের উপর সরকারি জমিতে বসবাসকারীদের মাত্র ১ টাকায় ৯৯-বছরের লিজ।

নিট ফল: দারিদ্র হ্রাসে অভূতপূর্ব সাফল্য। পিছিয়ে থেকে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এনএসএসও)-র ৬৯ দফার প্রতিবেদন: ২০১০-১১, রাজ্যে গ্রামীণ বাজারের আয়তন বেড়ে দাঁড়ায় ২৯,০০০ কোটি টাকা।

বামফ্রন্টের সময় পঞ্চায়েত তো বটেই, অনেক পঞ্চায়েত সমিতি এমনকি জেলা পরিষদ পর্যন্ত চালিয়েছে বিরোধীরা। কখনও মুর্শিদাবাদ, কখনও দক্ষিণ ২৪

পরগণা, কিংবা পূর্ব মেদিনীপুর। বামফ্রন্ট কখনও কোনওদিন সেগুলিকে ভাঙার চেষ্টা করেনি। সিপিআই(এম) কখনও বিরোধীদের ভোটে জেতা কোনও সদস্যকে কৌশলে ভাঙিয়ে আনার চেষ্টা করেনি। বাকি দেশের মতো দল-বদলের ঘটনা ছিল না। ছিল দিন-বদলের অনুশীলন।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৪ শতাংশ আসনেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' জয়ী হয়েছে তৃণমূল। যেখানে বামফ্রন্টের সময় ২০০৮ সালে শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই হার ছিল ৫.৫৭ শতাংশ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন ২,৮৪৫ জন, যেখানে ২০১৮-তে জয়ী হয়েছেন ২০,১৫৯ জন তৃণমূল প্রার্থী। ভোট দিতে পারেননি এক কোটির বেশি ভোটার। বৈপরীত্য আকাশ-পাতাল।

বামফ্রন্টের সময়ই বিরোধী দলের নেতাকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা। সুস্থ বিতর্কের দরজা হাট করে খোলা। বিধানসভায় আলোচনার অর্ধেক সময় বিরোধীদের জন্য বরাদ্দ। দেশের মধ্যে ছিল এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। দেশের মধ্যে এরাজ্যেই প্রথম লোকায়ুক্ত গঠন। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ এর আওতায়।

এবার যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে সেটা জাতীয় জীবনের একটি সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ভারতীয় সংবিধানকে বিপন্ন করছে 'হিন্দু রাষ্ট্র' স্থাপনের উদ্দেশ্যে। বকলমে এমন এক জমাট পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চাইছে, যারা হিন্দুত্ববাদী শক্তির বিশ্বস্ততম দোস্ত। কেন্দ্রে আসীন স্বৈরাচারী-ফ্যাসিবাদী শক্তি আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে ২০১৯ সালের সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর। যার ফলে শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের উপরে নেমে এসেছে ব্যাপক আক্রমণ। তারা পশ্চিমবঙ্গকে দেখছে এক লোভনীয় লক্ষ্যবস্তু হিসাবে। তারা জানে যে এই রাজ্যের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্য তুলনাহীন। এখানকার প্রগতিশীল রাজনীতির ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবস্নাত, দীর্ঘদিনের। কাজেই এই রাজ্যকে দখল করতে পারলে পুরো দেশকে কবজা করার পথে ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ব শক্তির বিশেষ বাধা তেমন থাকবে না। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক রীতির রক্ষণাবেক্ষণ করার স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে এই শক্তিকে আমাদের

পরাস্ত করতে হবে, আর এই শক্তির রাজনৈতিক প্রতিভূ বিজেপি-কে হারাতেই হবে।

বিজেপি যে পশ্চিমবঙ্গে দখলদারি করার এরকম দুঃসাহসী পরিকল্পনা করতে পারছে তার কারণ রাজ্যের শাসকশক্তি অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসই দরজা খুলে দিয়েছে তাদের জন্য। এই রাজ্য সরকার গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছে। খর্ব করেছে নাগরিক অধিকার। আর বামপন্থী শক্তিগুলির উপরে নামিয়ে এনেছে মাত্রাছাড়া আতঙ্ক ও নৃশংসতা ।

অথচ, এই বামপন্থী শক্তিই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বহু দশক ধরে অনতিক্রম্য বাধার পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তৃণমূল সরকারের সদিচ্ছার অভাব, প্রশাসনিক অপদার্থতা এমনই নিদারুণ যে সেটা বিজেপি-র পক্ষে সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাংবাদিকরা একবার জ্যোতি বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার রাজ্যে দাঙ্গা কেন হয় না? বসুর সহজাত জবাব ছিল, আমার সরকার দাঙ্গা চায় না, তাই দাঙ্গা হয় না। সরকার না চাইলে দাঙ্গা কখনোই হয় না। প্রবল প্রত্যয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলতেন, ‘দাঙ্গাবাজদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে’। সাম্প্রদায়িক শক্তি তাই মাথা চাড়া দেওয়ার সাহস দেখায়নি।

একদশক আগেও রাজ্যবাসীর মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব ছিল। রবি ঠাকুরের বাংলা, নজরুলের বাংলা। চৈতন্যদেবের বাংলা। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের বাংলা। এই কলকাতার হিন্দি পত্রিকাতেই ভগৎ সিংয়ের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ। বয়স তখন সতেরো। বিষয় ছিল ‘বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব’। স্বাধীনতার বছরে ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ সাহেব যখন চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পাকিস্তান ছেড়ে চলে এলেন, তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন এই শহরে। কারণ, এখানে সুরের ভুবনে অসুর আর শয়তানের প্রবেশ ছিল নিষেধ। এই কলকাতাই হয়ে উঠেছিল গুজরাট গণহত্যায় আক্রান্তের নিশ্চিত আশ্রয়। ১৯৮৪, গোটা দেশে যখন শিখরা আক্রান্ত, তখন এই শহরই ছিল তাদের নিরাপদ ঠিকানা।

তৃণমূলের শাসনে আজ সব কেমন যেন বেমালুম উধাও। নিজের চেনা জায়গা নিজেরই কাছেই কেমন যেন অচেনা।

আসানসোল— রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। ঝাড়খন্ড লাগোয়া এই শহরের অধিকাংশই হিন্দু। তাদের অর্ধেকেই হিন্দিভাষী অবাঙালি। এখানে এখন দুর্গাপূজার মতোই রামনবমীর রমরমা। রামনবমী আর হনুমানজয়ন্তী নিয়ে বেপরোয়া উন্মাদনা। বিজেপি শুরু করলেও সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে এসেছে তৃণমূল। কে কত বড় 'হিন্দু', তার উৎকট প্রতিযোগিতা। এক পক্ষ রাম সাজলে, আরেক পক্ষ হনুমান। চড়া আওয়াজে হিন্দি গান, প্রকাশ্যে তরবারি উঁচিয়ে পদযাত্রা। উগ্র হিন্দুত্বের উদ্ধত হিংস্র আস্ফালন।

সংখ্যালঘু মহল্লাগুলো কেমন যেন সিঁটিয়ে থাকে। ভয় দেখায় আরএসএস-বিজেপি। ভয় কাটানো নয়, সেই ভয়কেই আরও জাঁকিয়ে বসিয়ে এসেছে তৃণমূল। যাতে তৃণমূল সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য টেনে আনা যায়। উভয়ই দুদিক থেকে ফয়দা তুলতে মরিয়া। কম্পিটিটিভ কমিউনালিজম, প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা।

বিপরীতে মানুষ চাইছেন শান্তি। দশবছর আগেও এ রাজ্যে ছিল না কোনও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা।

বামপন্থীদের ঘোর বিরোধীরা পর্যন্ত এ নিয়ে কখনও বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে পারেননি। পায়ের তলায় জমি ছিল না আরএসএসের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে বড় অপরাধ, এই রাজ্যে বিজেপিকে ডেকে আনা। তাঁর কাছে বিজেপি 'স্বাভাবিক মিত্র'। স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশদের সহযোগী 'আরএসএস দেশপ্রেমিক'। সংঘ পরিবারের কাছে তিনি 'সাক্ষাৎ মা দুর্গা'। দেড় দশক আগে মোহন ভাগবৎ, মদন দাস দেবীর মতো কট্টর আরএসএস নেতাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে যিনি অকপটে বলেছিলেন, 'যদি আপনারা মাত্র ১ শতাংশও সমর্থন দেন, তবে আমরা অবাক করে দেব।'

দশবছরে সত্যিই অবাক করে দিয়েছেন। এখন এই রাজ্যেও ঘটে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা। বসিরহাট, আসানসোল, রানীগঞ্জ, ধুলাগড় থেকে কাঁকিনাড়া।

মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও তৃণমূল দুই মৌলবাদকে সমানে তোল্লা দিয়ে এসেছে। একদিকে রামনবমী, হনুমানজয়ন্তী থেকে পুরোহিত ভাতা, অন্যদিকে ইমাম ভাতা, মুয়াজ্জিনদের ভাতা। ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই ইমামদের জন্য আড়াই হাজার টাকা, মুয়াজ্জিনদের জন্য এক হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এতে মেরুকরণ তীব্র হলে হিন্দু ভোট পেতে দুর্গাপূজার উদ্যোক্তাদের ১০ হাজার টাকা করে অনুদান। বাড়তে বাড়তে গতবছর এক ধাক্কায় ৫০ হাজার টাকা। সঙ্গে বিদ্যুতের খরচে প্রতিটি পুজো কমিটিকে ৫০ শতাংশ ছাড়। সরকারি তহবিল থেকে কয়েকশ’ কোটি টাকা। সঙ্গে দলের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বছর-বছর ক্লাবকে ফুর্তির টাকা।

টাকার অভাবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতাও বাড়ে না। বাড়ে না বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা। হয় না অস্থায়ীদের মাসোহারা বৃদ্ধি। বেকারদের অবস্থা ভয়াবহ। ঝাঁ-চকচকে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল রয়েছে, টাকার অভাবে হয় না সরঞ্জাম কেনা। পরিকাঠামো নির্মাণ। কিংবা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ। জেলায় জেলায় প্রাইমারি স্কুলের উন্নতি সম্প্রসারণ হয় না টাকার অভাবে। টাকার অভাবে হয় না সেতু মেরামত। অথচ ৩৭ হাজার পূজা কমিটির প্রতিটিকে ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান! শুধু তা-ই নয়, বিদ্যুৎ বিলে ছাড়। বিদ্যুতের চড়া মাসুলের চাবুক সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর। কলকাতায় বেসরকারি সংস্থা অন্যভাবে পুষিয়ে নিলেও জেলায় সব দায়ভারই গিয়ে পড়ে সরকারি বিদ্যুৎ পর্ষদের ঘাড়ে।

রাজ্যে নিয়োগ বন্ধ স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুর্নীতির জন্য হাইকোর্টের রায়ে আপার প্রাইমারিতে মেধা তালিকা সম্পূর্ণ বাতিল। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে পঙ্গু করে হয়েছে নতুন বোর্ড। যা সংবিধান সম্মত নয়। দুর্নীতি, নৈরাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনে। হয়নি ক্লার্কশিপ পরীক্ষা। তাহলে কোথায় হবে কর্মসংস্থান? রাজ্যে বেড়েই চলেছে শূন্যপদের সংখ্যা।

বামফ্রন্টের সময় ছোট-মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান ছিল রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষে। অনেক পিছনে গুজরাট। এখন সবই সঙ্কটে। বেশিরভাগই বন্ধ। সিঙ্গুরে নব্বই শতাংশ তৈরি হয়ে যাওয়া কারখানা তাড়ানোর পর আর বিনিয়োগ আসেনি। জিন্দাল ইস্পাত কারখানা পুরোপুরি বন্ধ। বছর-বছর শিল্প সম্মেলন হয়েছে। বিনিয়োগ হয়নি।

এদিকে বেকারদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে দুই সরকারই ভাঁওতা দিচ্ছে। সম্ভাবনাময় তরুণদের বিপথগামী করছে। আর এই বিরাট বেকার বাহিনীকে ব্যবহার করতে চাইছে বিভাজনের রাজনীতিতে।

আর এই মেরুকরণের রাজনীতিতে তৃণমূলের চেয়ে বেশি ফায়দা লুটছে বিজেপি। তৃণমূলের নীরব প্রশ্রয়ে বাড়ছে, বেড়ে চলেছে আরএসএসের শাখা। ২০১১ সালে ছিল ৩৫০। এখন বেড়ে ১ হাজার ৪০০। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ইউনিট। জেলা, ব্লক, অঞ্চল মিলিয়ে ১ হাজার ৫০০-র কাছাকাছি। ভয় ছড়াতে প্রশিক্ষণ, সশস্ত্র আস্ফালনও সর্বত্র।

এবারে করোনার জন্য না হলেও, ঐতিহাসিক রেড রোডে এখন পূজা কার্নিভ্যাল। কুচকাওয়াজের জন্য ১৮২০ সালে ব্রিটিশ ভারতে এই বুলেভার্ড তৈরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানেই নামত বিমান। এত দিন এই চওড়া বুলেভার্ড ব্যবহৃত হতো ঈদের নামাজের জন্য। প্রায় দুই লাখ মানুষ এখানে নামাজে অংশ নেন। প্রতীকী বার্তা দিতে তাই রেড রোডেই তিন বছর ধরে পূজা কার্নিভ্যাল। মসৃণ রাস্তা বেয়ে একের পর দুর্গাপ্রতিমার বর্ণময় শোভাযাত্রা। রাস্তার এক পাশে মূল মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী থেকে মন্ত্রিসভার সদস্যরা। দর্শকদের জন্য জায়ান্ট স্ক্রিন। আয়োজনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। এ কোন্ মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির বাহার!

আগে বিসর্জন, মহরম– সব ধর্মের উৎসব হয়েছে একসঙ্গে। কখনও কোনও সমস্যা হয়নি। এখন হচ্ছে।

তবে আমাদের বিশ্বাস এখনও বামপন্থায় সমৃদ্ধ বাংলার মাটির উপর। আমাদের

প্রত্যয়, বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছিল তেভাগার লড়াই। ভরসা এখনও আসানসোলের নুরানি মসজিদের ইমামের ওপর। পুত্র খুনের পরেও জনতার উদ্দেশে যিনি বলেন, চোখের বদলে চোখ কোনও সমাধান নয়। ভিন্নধর্মের একটি মানুষও আক্রান্ত হলে তিনি আসানসোল ছেড়ে চলে যাবেন। ভরসা বামপন্থী, শুভবুদ্ধির সেই সব মানুষের ওপর, যারা রাতের পর রাত জেগে বস্তি, মহল্লা পাহারা দিয়েছে। রুখে দিয়েছে কুৎসিত ষড়যন্ত্র।

তৃণমূলের নিজেরই রেকর্ড গণতান্ত্রিক ধ্বংসযজ্ঞে। কাজেই আরএসএস-বিজেপি'র এই কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাধ্য তার নেই। আর সে ইচ্ছাও নেই।

একমাত্র বামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই বিজেপির বিরুদ্ধে দৃঢ় এবং দীর্ঘমেয়াদী লড়াই চালাতে পারে। গণতন্ত্র, বিভাজন নয়, জনগণের সার্বিক ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই তাদের শাশ্বত নীতির মূলস্তম্ভ। তারা জানে কর্তৃত্বপরায়ণ ফ্যাসিবাদের পিছনে আছে কোনও না কোনও বিধ্বংসী চালিকাশক্তি ও শ্রেণিবিন্যাসের রূপরেখা।

বামফ্রন্ট সরকারের কি কোনও সমস্যা ছিল না? ছিল। বহু সাফল্যের মধ্যেও সমস্যা ছিল। অশেষ সীমাবদ্ধতা ছিল। একটি দেশের একটি অঙ্গরাজ্যে অবিচলিত জনমুখী শক্তি ক্ষমতায়। প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টা লড়তে হয়েছে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত, সংবাদমাধ্যমের কুৎসা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। লড়তে হয়েছে দিল্লির প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে। এমনকি ওয়াশিংটনের ব্লুপ্রিন্টের বিরুদ্ধে। নাহলে ২০১১-তে পরাজয়ের পর নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানাতে কেন ছুটে আসেন মার্কিন বিদেশসচিব হিলারি ক্লিন্টন! সীমিত ক্ষমতায় এই ব্যবস্থার মধ্যেই 'বিকল্প নীতি' রূপায়ণ। ভূমি সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সবার উপর ছিল মানুষের জীবনজীবিকা ও কথা বলার অধিকার। সরকারকে সমালোচনার গণতন্ত্র। ধর্মতলার ব্যস্ত রাস্তায় মাচা বেধে ছাব্বিশ দিন সরকার-বিরোধী বিক্ষোভের নামে নাটক, আরএসএস-বিজেপি'র প্রকাশ্যে মদত। পুলিশ

যায়নি। গণতন্ত্রের ‘মন্দির’ বিধানসভা ভাঙচুর। ভিডিও ফুটেজ থাকলেও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। মাচা ভেঙে দিয়ে সিঙ্গুরে কারখানা করেনি। বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন থাকলেও, করেনি। সেদিন এমনই ছিল গণতন্ত্র।

রাজ্যে এখন প্রধান কাজ গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। সেজন্য প্রথম দরকার যাবতীয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। যাতে বলবৎ থাকে আইন-শৃঙ্খলা। বন্ধ হয় পুলিশ-দুষ্কৃতীদের আঁতাত। পুলিশ আর গুন্ডারাজ যাতে শাসকদলের হয়ে আইন-বিরুদ্ধ, গণতন্ত্র-বিরোধী কোনও অপকর্ম চালাতে না পারে। আইন-সংবিধান ও জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধ হতে হবে।

অবিলম্বে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন সেইসব দমনমূলক আইনের ব্যবহার বন্ধ করাতে যেগুলোর প্রবর্তন আগে হয়েছিল, কিন্তু বিজেপি সরকারের হাতে যেগুলোর ব্যবহার হচ্ছে বিরোধী শক্তিকে আতঙ্কিত করার জন্য। সমালোচনা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য। কোনও রাজ্য সরকার অবশ্য এইসব আইন রদ করে দিতে পারে না। কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে এই আইনগুলি কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার হবে না। এর মধ্যে আছে ইউএপিএ, এনএসএ, রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ইত্যাদি। কেউ সরকারের সমালোচনা করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। সিবিআই-কে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে রাজ্যের মধ্যে কোনও মামলা রুজু করার আগে।

সাম্প্রতিক কিছু আইন, যথা সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর, মুসলিমদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোনও একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যসৃষ্টি করার কাজে সিএএ’র ব্যবহার ঘোরতরভাবে সংবিধান-বিরোধী। মুসলিমদের ‘দ্বিতীয় শ্রেণির‘ নাগরিকে পর্যবসিত করার চক্রান্ত সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। আর পশ্চিমবঙ্গকে যে কোনও প্রকারে এই সুপরিকল্পিত বিভেদমূলক আইনের বাইরে রাখতে হবে।

গণতান্ত্রিক স্বাধীন ও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে আরো শক্তিশালী করতে হবে। পুলিশকে সরকারের হাতের পুতুল করা চলবে না।

শাসকদল যাতে পুলিশ ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন না করতে পারে সেজন্য দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা। গণতন্ত্রের প্রতি কঠোর দায়বদ্ধতা। কিন্তু আরো দরকার কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। যাতে নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত থাকে রাষ্ট্রের হাত থেকে (রাজ্যস্তরেও)। এবং বিপথগামী সরকারি আমলা ও আরক্ষাকর্মীদের শাস্তির বিধান থাকে, যাতে তারা শাসকদল বা অন্যতর সমাজবিরোধীদের মদত দিতে না পারে। এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে একাধিক রায়।বামপন্থী দল ও সহযোগীরা এই বিষয়ে স্পষ্ট ও দৃঢ়।

সংবিধানসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এখনও নামেই আছে। যেমন মানবাধিকার কমিশন, লোকপাল, মহিলা কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন, তফসিলী জাতি ও উপজাতি কমিশন ইত্যাদি। মানবাধিকার কমিশনকে বিশেষ করে বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা দান করা দরকার। এখনকার মতো আধা-বিচারবিভাগীয় মর্যাদা নয়। অবশ্য যত শক্তিশালীই হোক, কোনও একটি প্রতিষ্ঠান নাগরিক অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ আটকাতে পারে না। কিন্তু এখনকার তুলনায় বেশি ক্ষমতা দিলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রে আরো বেশি কার্যকর হতে পারবে।

উন্নয়নের প্রাথমিক শর্তই হল– শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থায়িত্ব। ঐক্য বিনা সে শান্তি ও স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। ঐক্যের ভিত্তিই হল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। তার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য। ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা এবং বিচ্ছিন্নতার সমস্ত প্রয়াসকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবে– এমন সরকারই চায় মানুষ। বিভাজনের শক্তি তৃণমূল ও বিজেপি এ কারণে উন্নয়ন, শান্তি ও গণতন্ত্রের পথে বাধা।

জীবনজীবিকার অধিকারের জন্য সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি অপরিহার্য গণতন্ত্রের সুরক্ষা। আজ গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে শক্তিশালী করতে হলে সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ এবং সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও একাধিপত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। রাজ্যগুলির অধিকার ক্রমাগত কেড়ে নিয়ে জনগণের অধিকার ধ্বংস করে চলেছে বিজেপি সরকার। সেকারণে জাতি, ধর্ম, ভাষা, অঞ্চল নির্বিশেষে সংবিধান প্রদত্ত মানুষের মৌলিক অধিকার যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং

মানবাধিকার রক্ষার যে কোনও প্রয়াসে সংগঠিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে মানুষকে। যাচাই করে নিতে হবে কে শত্রু, আর কে মিত্র। জীবনজীবিকা ও রাজ্যগুলির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কারা প্রকৃত লড়াই করতে পারে– বেছে নিতে হবে সেই মিত্রকে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দ্রুত খর্ব করে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তুলতে তৎপর বিজেপি। বাম ও সহযোগীরাই একমাত্র এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে পারে।

বিনা বিচারে আটক, মিথ্যামামলা, সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ বিচারের প্রহসনের বদলে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভবিষ্যৎ নাগরিক শিশু-কিশোর, ছাত্রদের স্বার্থরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারকে দিতেই হবে অগ্রাধিকার। গরিব ও কর্মহীনদের জন্য কাজ, ন্যায্য মজুরি জীবনজীবিকা রক্ষার ব্যবস্থার পাশাপাশি এসব অধিকারের জন্য আন্দোলনের পাশে নিরন্তর থাকব– চাই এমন সরকার।

বামপন্থী ও সহযোগীরাই একমাত্র দিতে পারে এই নিশ্চয়তা।

অন্ধবিশ্বাসের বদলে মুক্ত চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে শক্তিশালী করতে হবে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুন্ডামী, মস্তানী, তোলাবাজি, দুর্নীতি রদ করে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।

সরকারি পদে অধিষ্ঠিত কেউ ধর্মীয় আবেগ, ঘৃণা, হিংসার বশবর্তী হয়ে যাতে কোনও কার্যকলাপ করতে না পারে– তার জন্য সুনিশ্চিত করতে হবে পক্ষপাতহীন প্রশাসন। কে পারে এমন প্রশাসন চালাতে! বাম-সহযোগীরাই।

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই এখন দলবদলের হিড়িক।

সকালে তৃণমূল। বিকেলে বিজেপি। একই উঠোনের দুই দালান। তৃণমূলের প্রাক্তনীদের নিয়ে গঠিত বিজেপি'র রাজ্য কমিটি। আর তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে বিজেপি'র গন্ধ। বিজেপি'র সবচেয়ে বড় সাপ্লাইলাইন তৃণমূল। রাতারাতি তৃণমূলের দলীয় দপ্তরে বিজেপি'র ব্যানার। সন্ধ্যায় চ্যানেলে-চ্যানেলে তার মুখরোচক

খবর। সকালের দৈনিকে পাতাজোড়া শিরোনাম। দলবদলের তরজা। জনগণের স্বার্থরক্ষা, বিভাজনের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া, গণতান্ত্রিক শক্তির প্রসার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপসহীন কঠোর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারে একমাত্র বাম-গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি।

নির্বাচনী লড়াইকে তৃণমূল ও বিজেপি'র মধ্যে আটকে রাখার জন্য মিডিয়া, বিপুল অর্থের ব্যবহার ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানো– সবই চক্রান্তের অংশ। আর এই উৎকট প্রচারের আতিশয্যে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা। দুই অপশক্তির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ হতে হবে। উদ্যোগী হতে হবে।

সেকারণে, একই খোয়াড়ে দলবদল নয়।
খোয়াড় ভেঙে চাই দিনবদল।
স্বৈরজমানার বদল।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড সুখেন্দু পাণিগ্রাহী
কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং এস পি কমিউনিকেশনস, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৫ টাকা